

যেতে পারে। শুদ্ধ আচরণের সাহায্যে মানুষ কীভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে তা এ দর্শনের অন্যতম আলোচ্য।

৫. নৈতিকতা সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা যে সবসময় তাত্ত্বিক আলোচনায় পর্যবসিত হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ট্রামে-বাসে, ট্রেনে, রেস্টোরাঁয় অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন যুদ্ধ, স্বস্তিমৃত্যু, ভূগহতা প্রভৃতির নৈতিকতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে থাকেন। এসব মতামতের কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। যাঁরা এরকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৈতিক তত্ত্বে অপারদর্শী। আলোচ্য বিষয়টিকে সমর্থন বা সমালোচনার জন্যে, তাঁরা নিজস্ব যুক্তির সাহায্য নিয়ে থাকেন মাত্র। বৃহত্তর অর্থে এ আলোচনাও নৈতিকতা সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা।

বই-এর এই পর্বের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে প্রধানত আদর্শমূলক নীতিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে।

৩. নীতিবিদ্যা বা এথিক্সের লক্ষণ

একজন লেখক—উইলিয়াম লিলি—তার অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু এথিক্স বইতে নীতিবিদ্যার লক্ষণ (ওঁর ভাষায় প্রভিসনাল ডেফিনিশন বা কাজ চালিয়ে নেবার মত লক্ষণ) স্থির করেছেন এইভাবে :

নীতিবিদ্যা হল সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কিত এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (normative science of the conduct of human beings living in societies)।

লিলির দেওয়া এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে এথিক্সের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা :

(ক) নীতিবিদ্যা একরকমের বিজ্ঞান।

(খ) নীতিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

(গ) নীতিবিদ্যা মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করে থাকে।

(ঘ) নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করে।

আমরা লিলিকে অনুসরণ করে এই ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট করবার চেষ্টা করব।

প্রথমত, নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা হচ্ছে। কাকে বলে বিজ্ঞান? এর উত্তরে বলা যায়, নির্দিষ্ট কিছু পরস্পর-সম্পৃক্ত ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে সুশৃঙ্খল (systematic) এবং মোটামুটি সম্পূর্ণ (more or less complete) জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। লিলির মতে, বিজ্ঞানের এই লক্ষণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল—‘সুশৃঙ্খল’। বস্তুত, সাধারণ মানুষের এলোমেলো অসংবদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রধান তফাৎ এইখানে যে, বিজ্ঞান কখনও বিশৃঙ্খল জ্ঞানকে প্রশ্রয় দেয় না। একটা বিজ্ঞান (যেমন, মহাকাশবিজ্ঞান কিংবা উদ্ভিদবিজ্ঞান) তার তথ্যগুলোকে এলোপাথাড়ি শুধু সংগ্রহ করেই স্ফুট থাকে না। এসব সংগৃহীত তথ্যকে নানাভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলাটাও তার একটা কাজ। বলা যায়,

প্রধান কাজ। এই সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার কাজটা বিজ্ঞান সম্পন্ন করে তথ্যগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, জড়জগতের নিয়মাবলী আবিষ্কারের সূত্রে পদার্থবিজ্ঞান জড়জগত-সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে একসূত্রে বেঁধে দেয়। এই যে শৃঙ্খলা-প্ৰীতি, এটি যেকোনো বিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া, প্রতিটি বিজ্ঞান তার নিজের এলাকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাখবর দিতে আগ্রহী হয়। যথা : উদ্ভিদবিজ্ঞান পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস করতে উদ্যোগী হয়। শুধু আমাজন অরণ্যের উদ্ভিদগুলোর প্রজাতিভেদ করে সমুদ্র থাকে না। প্রাণিবিজ্ঞানও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্রজাতিভেদ নির্ণয়ে আগ্রহী হয়। লিলির মতে, এই সম্পূর্ণতা-প্ৰীতিও বিজ্ঞানের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। লিলি বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : একটা দাবি তখনই ‘বৈজ্ঞানিক’ (scientific) বলে স্বীকৃতি পায় যখন দাবিটা বিজ্ঞানীদের সমর্থন পায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো রোগনিরাময়ের প্রস্তাব তখনই ‘বৈজ্ঞানিক’ বলে স্বীকৃতি পায় যখন এ প্রস্তাব চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের দ্বারা সমর্থিত হয়। তা ছাড়া বিজ্ঞানের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে, প্রতিটি বিজ্ঞান বিশ্বের এক একটি মাত্র এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে স্ফুট থাকে। কোনো বিজ্ঞানীই বিশ্বের সমস্ত রহস্য উন্মোচনের দায় নেন না। বস্তুত এইজন্যেই এলাকাভিত্তিক একাধিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে, যথা, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, কমপিউটার-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

ক্রমবদ্ধতা, নিরপেক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সত্যানুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞানের এসব গুণ নীতিবিদ্যার মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান রয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি তৈরি করার মধ্য দিয়ে নীতিবিদ্যা মানুষের স্বেচ্ছাপ্রসূত কাজগুলোকে নৈতিক এবং অনৈতিক, এই দুটি আলাদা আলাদা শিরোনামের অধীনে বেঁধে ফেলে। এইভাবে বিজ্ঞানের শৃঙ্খলানিষ্ঠতা নীতিবিদ্যার কার্যক্রমের অঙ্গ হয়ে যায়। তা ছাড়া, নীতিবিদ্যা বিজ্ঞানের মতই নিরপেক্ষ বিচারবিবেচনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেসব সমস্যার মুখে পড়ে, নীতিবিদ্যা সেইসব সমস্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে শেখায়। শুধু তাই নয়, এসব সমস্যার মূল কথাগুলোকে স্পষ্টতর করে তুলতেও নীতিবিদ্যা বিশেষ ভূমিকা নেয়। এইসব দিক থেকে দেখলে নীতিবিদ্যার বিজ্ঞানধর্মী চরিত্রটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, নীতিবিদ্যাকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়েছে। বিজ্ঞান দু’রকম : বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (positive science) এবং আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (normative science)। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের চেহারাটা হল বিবরণধর্মী (descriptive)। স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরি-গুলোতে যে-ধরনের বিজ্ঞান শেখানো হয় সেগুলো সব বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এসব বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল বিশ্বের বিশেষ কোনো এলাকার জিনিসগুলোর অনুপাত বিবরণ দেওয়া। যেমন, উদ্ভিদবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল তামাম উদ্ভিদের খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া,

মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানুষের যাবতীয় মানসবৃত্তির ত্রুটিহীন বিবরণ প্রস্তুত করা, ইত্যাদি। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বা বিচারের (judging) কোনো ভূমিকা নেই। উদ্ভিদবিজ্ঞানী উদ্ভিদের সৌন্দর্য বিচার করতে বসেন না, মনোবিজ্ঞানীও মানুষের মানসবৃত্তিগুলোর মূল্যায়নে (অর্থাৎ তাদের ভালো-মন্দ বিচারে) আগ্রহী হন না। কিন্তু এমন কিছু বিজ্ঞান আছে যেখানে আদর্শ (norms) অথবা নিয়মবিধি (rules) অথবা নির্ণয়দণ্ড (criteria) ইত্যাদির ভিত্তিতে কিছুই না কিছুই মূল্যায়ন করা হয়। এসব বিজ্ঞানকে বলে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (normative science)। উদাহরণস্বরূপ নন্দনতত্ত্বের কথা বলা যেতে পারে। যেসব মাপকাঠির নিরিখে চান্দ্রুব প্রত্যক্ষের বিষয়গুলোকে দৃষ্টিনন্দন বলা যায়, সেইসব মাপকাঠির একটা সম্পূর্ণ (complete) এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ (systematic) সমীক্ষা-হাজির করে নন্দনতত্ত্ব। 'লজিক' নামে শাস্ত্রটিরও লক্ষ্য এইরকম বিজ্ঞানধর্মী এবং মূল্যায়নভিত্তিক চর্চা। যেসব নিয়মবিধির নিরিখে আমাদের যুক্তিতর্কের বৈধতা-অবৈধতা স্থির করা যায়, সত্যিকারের লজিক সেইসব নিয়মবিধিকে একটা সম্পূর্ণ তন্ত্রের (complete system) আকারে রূপ দেয়। তাই নন্দনতত্ত্বের মত লজিকেও আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা চলে। এথিক্স-ও এই অর্থে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। কারণ, এথিক্স কিছু আদর্শ বিধির নিরিখে মানুষের আচারআচরণের মূল্যায়ন করে। অর্থাৎ এসব আচারআচরণের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা (rightness or wrongness) স্থির করে, এবং ওই আদর্শ বিধিগুলোকে একটা সুশৃঙ্খল সম্পূর্ণতা দিতে এগোয়। আরও একটা কারণে এথিক্সকে আদর্শনিষ্ঠ বলা উচিত। তা হল, মানুষ এযাবৎ যেসব আচরণবিধি অনুসরণ করে এসেছে, এথিক্স সেইসব আচরণবিধির সূচাক্রম এবং সুশৃঙ্খল বিবরণ দিয়েই শুধু সন্তুষ্ট থাকে না। এসব আচরণবিধি কেন বৈধ বলে গণ্য, সেই প্রশ্নের বিচারও এথিক্সের অন্যতম কাজ।

তৃতীয়ত, নীতিবিদ্যাকে আচারআচরণ (conduct) সম্বন্ধীয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়েছে। আচারআচরণ বলতে এখানে বুঝতে হবে মানুষের সেইসব ক্রিয়াকাণ্ড যেগুলো সে স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় করে থাকে। নীতিবিদ্যার পরিভাষায় বলতে গেলে, একমাত্র ঐচ্ছিক কর্মগুলোই (voluntary actions) নীতিবিদ্যার বিবেচ্য। নিরৈচ্ছিক কর্ম (non-voluntary) নীতিবিদ্যার আলোচ্য নয়। যেসব কাজ মানুষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে নেই সেইসব কাজকে নিরৈচ্ছিক কর্ম বলা হয়। পাকস্থলীর হজম-প্রক্রিয়া, শরীরের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া, এগুলি মানুষের জীবনধারণের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এসব প্রক্রিয়া মানুষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন নেই। তাই এগুলোকে নিরৈচ্ছিক কর্ম বলা যায়। স্বতঃপ্রসূত ক্রিয়া বা র‍্যানডম অ্যাকশন (যেমন, সন্দোজাত শিশুর হাত-পা ঝোঁড়া), প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন (যেমন, পায়ে কাঁটা ফুটলে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে ওঠা), সাহজিক ক্রিয়া বা ইনস্টিংকটিভ অ্যাকশন (যেমন, উন্মাদপায়ী জীবের স্তন্যপান করার অভ্যাস), ভাবজ ক্রিয়া বা ইডিও-মোটর অ্যাকশন (যেমন, ফুটবল

খেলা দেখতে দেখতে ভাবের বশে নিজেই পা চুক দেওয়া), এরকম অনেক ক্রিয়াকাণ্ড নিরৈচ্ছিক কর্মের দৃষ্টান্ত। পশুপাখির, উদ্ভাদের এবং শিশুর আচরণও নিরৈচ্ছিক। যেহেতু নিরৈচ্ছিক কর্মের বেলায় কাজটা করার কিংবা না-করার ব্যাপারে কর্তার কোনো স্বাধীনতা থাকে না, তাই এসব ক্ষেত্রে নৈতিকতার দায় কর্তার ওপর বর্তায় না। ফলে, এ-জাতীয় ক্রিয়াকাণ্ড এথিক্সের আলোচ্য হয় না। পক্ষান্তরে, ঐচ্ছিক কর্মের (voluntary action) বেলায় মানুষ স্বাধীন। সে স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় এসব কাজ বেছে নেয়। যথা, নিজের বিপদ জেনেও অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, জেনে-বুঝে অন্যকে প্রতারণা করে, স্বেচ্ছায় বিব খায়, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে নৈতিকতা-অনৈতিকতার দায়টি কর্তার ওপরে বর্তায়। ফলে, এ-জাতীয় ঐচ্ছিক ক্রিয়াকাণ্ড এথিক্সের আলোচ্য হয়। ঐচ্ছিক কর্মগুলোর মধ্যে উচিত-অনুচিতের লক্ষণরেখা টান এথিক্স। অর্থাৎ, এসব কর্মের মধ্যে কোনগুলো উচিতকর্ম আর কোনগুলো অনুচিতকর্ম সেই সম্পর্কে এথিক্স বিচার-বিবেচনা করে। এই বিচারবিবেচনাকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার জন্যে নানা মূলনীতি তৈরি করাও এথিক্সের কার্যক্রমের অঙ্গ হয়।

চতুর্থত, নীতিবিদ্যাকে সমাজবদ্ধ মানুষের আচারআচরণ সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়েছে। লিলি মনে করেন, নীতিবিদ্যার লক্ষ্যের মধ্যে এই 'সমাজবদ্ধ' (living in societies) কথাটি থাকার দরকার আছে। কারণ, 'সমাজবদ্ধ' কথাটি আমাদের মরণ করিয়ে দেয় যে, সামাজিক জীব হিসেবেই মানুষ উচিত-অনুচিতের অনুশাসনে বাঁধা পড়ে। একজন মানুষের সারাজীবনের কাজকর্ম যদি এইরকম হত যে, সেইসব কাজে সমাজের অন্য কারো উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অন্তি ঘটবারও আশঙ্কা নেই, তাহলে সেই মানুষটির কাজকর্মকে উচিত অথবা অনুচিত বলে চিহ্নিত করা যেত কি? লিলি এই প্রশ্নে অ্যারিস্টটলের একটি বহুখ্যাত উক্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন : যার সমাজে বসবাস করার প্রয়োজন নেই কারণ সে অন্যের দার দারে না, সে অবশ্যই পশু কিংবা দৈবতা। অনেকে আপত্তি করতে পারেন, সেক্ষেত্রে রবিনসন ক্রুসোব মত নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসীর আচারআচরণকে ভালো অথবা মন্দ বলা অর্থহীন হবে। লিলি বলছেন : না, অর্থহীন হবে না। কারণ, ক্রুসো তো জন্ম থেকে ঐ জনহীন দ্বীপে ছিলেন না। ওখানে গিয়ে পড়বার আগে তাঁর একটা সামাজিক জীবন ছিল এবং সেই সামাজিক জীবনে তাঁর আবার ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। সুতরাং নির্জন দ্বীপবাসী ক্রুসোর আচারআচরণ সম্পর্কে যখন উচিতার্থক শব্দগুলো প্রযুক্ত হবে তখন সেই সব শব্দের অর্থ খুঁজতে হবে তাঁর পুরনো সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। লিলি লক্ষ্য করেছেন, সাধারণ লোকব্যবহারের (common usage) মধ্যেও এথিক্সের এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটি সমর্থিত হয়েছে। সত্যি কথা বলার সামাজিক প্রক্রিয়াটি লোকব্যবহারের চোখে সহজেই এথিক্সের আলোচ্য বলে গণ্য হয়, এথিক্স-১